শ্মশানের সন্তানেরা

রঙ্কু দাস

জীবনের আনাচে - কানাচে আমরা হাঁটাহাঁটি করি সর্বদা, কিন্তু যাদের কথা মাস দুয়েকের অনুসন্ধানের পর আজ লিখতে বসছি তারা ঘুরে বেড়ায় মৃতদের আনাচে - কানাচে । কোন্ কোন্ সাহিত্যে এ পর্যন্ত ওরা ঠাঁই পেয়েছে বা কোন্ কোন্ সমালোচক এদের নিয়ে ভেবেছেন--- আলোচনা করেছেন ; এই মুহূর্তে সেইসব তথ্য আমার যেমন অজানা মনে হচ্ছে, তেমনই ওই জাতীয় তথ্যের কোনো প্রাসঙ্গিকতাও আমার কাছে নেই। বিশিষ্ট অধ্যাপক বন্ধুর অনুরোধের পর লিখতে গিয়ে অনেক বিষয় চিন্তাতে এসেছে। মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ স্পর্শ আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বলেই শ্মশান - গোরস্থান নিয়ে থিম্ -এর অভাবও তেমন হয়নি। তবু সে সবের মধ্যে যে বিষয়টা মূল্যবান বলে মনে হয়েছে ; তা একান্তই ভবঘুরে জীবনের বৃত্তান্ত। এই ভবঘুরেরা ঘুরে বেড়ায় শ্মশান কিংবা গোরস্থানের জঙ্গলে। আসলে ওদের দেখতে দেখতে বারবার মনে হয়েছে ওরা ব্রাত্য, সমাজ অবহেলিত কিংবা মানুষের ভিড়ে ক্লান্ত। তাই ওদের নিয়ে আখ্যান।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর পৌর মহাশ্মশান আগে ছিল বর্তমান গঙ্গার প্রায় বুকে। গঙ্গা পাড় ভাঙতে ভাঙতে এখন অনেক এগিয়ে এসেছে। ফলে যে শ্মশান চরিত্রের কথা লিখতে চলেছি সে ভালোবাসত শ্মশানটাকে। দুটি বড় বড় বটগাছ ছিল গঙ্গার গায়ে, মাঝে ছিল দুটো পোড়া লোহার চুল্লি। চুল্লির সামনে একটা ভয়ংকর কালীমূর্তি ও তার মন্দির। লাগোয়া একটা বড় ঘর। জানালা - দরজাহীন সেই ঘরে শ্মশানযাত্রীরা বসত, মদ খেত, কাঠ - কয়লা দিয়ে লিখত যা মনে আসে । যে সব ছেলেরা খুব পাকা তাদের ইস্কুলের কিংবা স্টেশনের বাথমের যেমন লেখা থাকে ঠিক সেরকম নয়। একজনের সঙ্গে আর একজনের প্লাস - মাইনাস সম্পর্ক, অথবা যিনি মারা গেলেন -- গভীর আবেগে তাঁর নাম -ঠিকানা লিখে দিত শ্মশানযাত্রী ছেলেরা। রাম ওই লেখাগুলো কোনোদিন মুখস্থ করেনি। অথচ ওইঘরটাই চিল রাম অর্থাৎ রামচন্দ্র মন্ডলের দিনে প্রায় ১৮ ঘন্টার আস্তানা। সকাল ৭টা - ৮টা থেকে রাত ১২টা পযন্ত রামকে পাওয়া যায় শ্মশানে । ২৬ - ২৭ বছরের যুবক। গরমের দিনে অধিকাংশ সময় আদুল গা, লুঙ্গিটা ভাঁজ করা হাঁটু অবধি। দু- একদিন দুপুরে বাড়ি যায় দু - এক ঘন্টার জন্য। ও স্নান করে শ্মশানের লাগোয়া গঙ্গায়, মাঝে মাছ ধরে এর ওর ছিপ দিয়ে।শ্মশানে আড্ডা মারতে বা মদ খেতে আসে যে সব দলগুলো তাদের থেকে চেয়েচিন্তে খায়। কোনো স্বপ্ন নেই ওর, নিজেকে নিয়ে কল্পনাও নেই। মৃতদেহ সৎকার দেখে ওর কোনো ভ্রুক্ষেপ হয় না--- একথা ও নিজেই জানিয়েছে। রাম অপেক্ষা করে চণ্ডী সাধুর, আর কোনো দিন মড়ার। চণ্ডীসাধু সন্ধ্যার আগে আগে আসে শ্মশানে, দলবল নিয়ে। বেশ বড় কলকেতে গাঁজা খায়। রাম প্রসাদ পায়। কীসব আলোচনা হয় রাম যেসব বোঝেনি কোনোদিন, গাঁজা খেয়েছে আর গাঁজা চেয়ে রেখেছে পরের জন্য। মাঝে মাঝে সে নিজেও কিনে এনেছে; ---এই তথ্য পেতেই ব্যাপারটা স্ট্রাইক করল মাথায়, শ্মশান ভবঘুরে রামের সোর্স অব ইনকাম কী ? রামই জানিয়েছে ঃ বাড়ি থেকে পয়সা নেওয়ার বা পাওয়ার কোনো উপায় ওর নেই। গঙ্গার চরে ওদের বাড়ি। বাড়িতে বাবাআছে, দুই মা আছে. আর আছে দুটো বোন, একটা ভাই। বাবা মাছ ধরে, ওর নিজের মা অসুস্থ,বাবার দ্বিতীয় পক্ষসুতো করে। সংসার চলে যায়। তবে রামের আয় সংসার থেকে নয়। মাঝে মাঝে শ্মশানযাত্রীদের ফরমায়েশ খেটে সে দু-পাঁচ টাকা রোজগার করে। ওর হাতখরচ চলে যায়। রামের কাছে গিয়ে বললেও অবাক হয় না। প্রশ্ন করে না, পরিচয় জানতে চায় না, গল্প করে। মাথামুণ্ডু নেই সেসব গল্পের। দূরে যে চড়া উঠেছে তার গল্প, কালরাত্রের শ্ম

ানযাত্রীদের দৌরাত্ম্যের গল্প, চণ্ডীসাধুর ভরের গল্প --- সব কেমন যেন মুখস্থের মতো বলে যায়। রামের মুখস্থ প্রত্যেক দিনের মড়ার সংখ্যা আর শ্মশান মস্তানদের নাম।

বর্তমান কালের মতো করে লিখলেও এ হল বছর চারেক আগের বাস্তব। আজ চিত্রটা কিছু কিছু বদলেছে। তবু সত্যিটা বদলায়নি । আগে শ্মশানটা গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার পর নতুন চক্‌চকে শ্মশানটাতে রাম এখনও থাকে দিবা -রাত্রি। এখনও গাঁজা খায়, একে -- ওকে বিক্রিও করে । মা মারা গেছে যেদিন সেদিনও সে শ্মশানেই ছিল। এখন স্থবিরতা বেড়েছে, শরীর জীর্ণ হয়েছে অনেক, দাড়ি -গোফঁ প্রায় কাটে না। বাড়িতে অর্থ দেয় না, তাই খেতেও পায় না। দুরের হোটেলে গিয়ে ধার - বাকিতে পেট চালায়। জীবনের মূল্যহীন মুহুর্তগুলো রাম কাটিয়ে চলেছে এইভাবেই।
বখ্‌তার ঘাট থেকে (বখ্‌তিয়ার খিলজি নোঙর করেছিলেন বলে কথিত) নৌকায় উঠলে ওপারে নামিয়ে দেয়। গঙ্গার প াড় ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলে নির্জন চাষের খেতের পর একটা শ্মশান পড়ে। ফুলতলা, চরভাঙা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের লে াকেরা মারা গেলে এই শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে আসে। এ পাশের লোকেরা শ্মশানটাকে মড়িঘাট বলে। মড়িঘাট -এর ঘ াটটা ছোট, কিন্তু দু'পাশে বেশ বিস্তীর্ণ জমি, যেখানে চাষ আবাদও হয় না। ঘাট থেকে হাঁটা পথেমিনিট দুয়েকের দুরত্বে একটা চালা করা আছে। চারপাশে বাঁশের খুঁটি, উপরে খড়ের চালা, আর চালার মধ্যে একটা উঁচু বাঁশের মাচা। বেশ বড়, আট-দশজন অনায়াসে বসে আড্ডা দিতে পারে। চালাটা শ্মশানযাত্রীদের প্রয়োজনেকরা হয়েছে বলে বিশ্বাস হবে না। ওটা মূলত লজেনের চালা। একটু ঢোঁক গিলতে হবে, লজেন! সেটা আবারকী !

লজেন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক এক শ্মশান ভবঘুরে। মিশমিশে কালো শরীর, হাত - পায়ের নখ বড় বড় । দাঁতগুলো কেমন অদ্ভুত রকম ধারালো --- যেন কাঁচা মাংস খায়। অনর্গল ইংরাজি বলে, সঠিক শুদ্ধ উচ্চারণ । বাংলা ব্যাকরণ, অঙ্ক, রস ায়নে এর বেশ নলেজ আছে। গায়ে ফাটা - ছেঁড়া কোঁচকানো জামা, পরনে নোংরা ফুল প্যান্ট, তাও বোতামহীন কে ামরে দড়ি দিয়ে বাঁধা । ওর পুরো নাম জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর পাওয়া যায়নি। ও বলে ওর নাম লজেন, কিছু দুরের গ্র ামের লোকগুলো ওকে লজেন বলেই চেনে। একবছরের বেশি সময় ধরে লজেন চালা ঘরটাতেই থাকে। সকাল - দুপুর - রাত সবসময়ই লজেন চালাঘরটাতেই বসে থাকে। চারপাশ খোলা মাচার উপর থেকে লজেন হয়তো পর্যবেক্ষণ করে আমাদের অদৃশ্য কোনো ভালোলাগার। দিনে একটা - দুটো মড়া আসে মড়িঘাটে। শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে লজেন গল্প করে। অদ্ভুত - অসম্ভব সে সব গল্প। কাল রাতে একটা কুকুর নাকি তাকে আক্রমন করলে সে কুকুরটাকে আঁচড়ে দেয়, ক ামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ; পালিয়ে যায় কুকুরটা। গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দুপুরবেলা খেতে চায় লজেন। প্রায় দিনই খেতে পায়। এছাড়া দু-একটা চায়ের দোকানে জল এনে দিলে মুড়ি পায়, বিস্কুট পায় --- দু - এক কাপ চা প ায় খেতে। বেঁচে থাকে, লজেন বেঁচে থাকে ---মড়িঘাটে।

যে স্থান মৃত্যুর সঙ্গেই সম্পৃক্ত, সেখানেই জীবন কাটে লজেনের। সারাক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে, নিজে নিজে, গান গায়, বাবা- মা-বাড়ির নাম মনে করতে পারে না। মৃত্যু সম্পর্কে বা শ্মশান বৈরাগ্য সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ নেই ওর। এ বরং লজেনের নিশ্চিন্ত বাসস্থান। এই বাসস্থানে লজেন কবে, কোথা থেকে এল তার নির্দিষ্ট সাল - তারিখ - তথ্য যেমন অ ামাদের জানা নেই ; তেমনই জানা নেই লজেনের চলে যাওয়ার দিন কবে। শুধু বিস্মিত হতে হয়--- লজেনকে দেখে, অ ার বিস্মিত হতে হয় ওর নাম দেখে। কারণ ভালো ভালো লজেঞ্চুসের একটা নাম ও জানে নাও। জানে তৎসম শব্দের সংজ্ঞা । শেষ যেদিন ওর সাথে গল্প করি সেদিন ও আমাকে তৎসম শব্দের সংজ্ঞা বুঝিয়েছিল।

লজেনের মতো ঝপাগ্‌লাও মদ - গাঁজা কিছুই খায় না। হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি আর কাঁধে এপাশ - ওপাশ ঝে ালানো একটা পুরনো রঙচটা সাইডব্যাগ। কীসব থালা -বাটি থাকে ওই ঝোলার মধ্যে। কৃষ্ণনগর শহরের একদম প্রান্ত দেশে জাতীয় সড়কের প্রায় পাশেই একটা ছোট্ট শ্মশান রয়েছে। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, ভিতরে বাঁশঝাড়, দর্মা দেওয়া কালীমন্দির পাশে স নদী (খোরে), আর মৃতদেহ সৎকারের গর্ত। সবটাই পুরোপুরি নির্জন । ঝকে লোকে কেন পাগল

বলে আমি অনুসন্ধান করতে পারিনি। ওর চরিত্রের সবদিকই শ্মশান ভবঘুরের মতো, পাগলের মতো নয় অন্তত। বাঁশঝাড় তলায় বসে বসে ও ছোট ছোট নুড়ি ফেলে জলে। রাত কাটায় ওই শ্মশানেই।কিন্তু সকাল নটা - দশটা বাজতেই ও শ্মশানে থাকেনা আর। রাস্তা দিয়ে লাঠি নিয়ে ব্যাগ কাঁধে হন্‌হনিয়ে হাঁটে।
সময়ে কুকুর তাড়া করে, সময়ে রাস্তার ছোট ছোট বিচ্চু ছেলেগুলো ঝকে খেপায় ; ঝ লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। প্রশ্ন করলে ঝ কোনো উত্তর দেয় না, কেমন যেন চুপচাপ। কোথায় যায় ঝ ? এই উত্তর জানতে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয় আমাকে।

শ্মশানটিতে শহুরে শব বেশি দাহ হয় না। নিতান্ত দরিদ্র কিংবা একটু দূরবর্তী গ্রামের শব ও শিশু মৃতদেহ পুঁততে আসা ছাড়া শ্মশানে ভিড় বলতে নেই। আশ্চর্য এটাই প্রতিদিন যে ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা ঝ শ্মশানে থাকে, তার মধ্যে সে আগত শ্মশানযাত্রীদের খোঁজখবর করে। তাদের বাড়ি - ঠিকানা জেনে নেয়। তারপর অনাহুতের মতো ---তাদের শ্রাদ্ধের বাড়িতে আনুমানিক দিনক্ষন দেখে হন্‌হন্‌ করে পৌঁছে যায়। সারাদিন কাজ করে দেয়, ভোজবাড়ির পাতা ফেলে, দুটো পেট ভরে খায়, দুটো ডাল-ভাত ঝোলার মধ্যে পুরে নেয়,শ্মশান ফিরে আসে। মা - বাপ - ভাই - বোন কেউ নেই ঝর । নেই কোনো অর্থের সংস্থান।শ্মশানে বসে থাকা এর কাজ, আর কাজ মৃতের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে সময়মতো সেখানে গিয়ে অধিক শ্রমের পরিবর্তে অল্প খাদ্য নেওয়া । কবে থেকে এই অদ্ভুতপেশায় আক্রান্ত ঝ? উত্তর মেলে অনেক দিন। বাহান্ন বছর বয়স্ক ঝ ভুলে গেছে --- করে থেকে সে এভাবে দিন কাটাচ্ছে। ডান গালে একটা ঘা হয়েছে, একটা কষের দাঁত দেখা যায় সেখান দিয়ে, কথা বললে মুখ দিয়ে থুথুছিটকে আসে। আর দিনের পর দিনশ্মশান ভবঘুরে ঝ এইভাবেই বেঁচে থাকে।

বেঁচে থাকার পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম বুড়োর। বুড়ো মানেশ্মশান বুড়ো, আসল নাম বুদ্ধদেব সরকার। বুদ্ধ বলে ওরা ডোম, মড়াপোড়ানো এদের প্রাচীন পেশা। যুগ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে - জীবিকাও বদলেছে। ওর এক দাদার চালের দোকান, বাবা বাজারে ফল বিক্রি করে। ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধ একরোখা, পড়াশুনো ওর ভালো লাগত না। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় বাবার বকুনিতে সে প্রথমবার পালিয়ে আসে শ্মশানের দিকে। কালনার (বর্ধমান জেলা) শ্মশানটার মধ্যে ঠিছক অন্যপ্রান্তীয় ভয়ংকরতা নেই। সবসময়ই শ্মশানের পাশ দিয়ে খেয়াঘাটের রাস্তায় শয়ে শয়ে লোক - যাতায়াত করে।শ্মশানটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে। পরপর সাজানো অনেকগুলো চুল্লি, একপাশে উঁচু করে সাজানো মড়ার ঘাট, আর অন্যদিকে কাঠকয়লার স্তুপ। বিকেল হয় হয় এরকম একটা সময় শ্মশানের তারণ চৌধুরী (ঘাট জমা নিয়েছে যারা, তাদের একজন) জিজ্ঞাসা করে কীরে তুই কে ? এখানে বসে কেন ? বুদ্ধ উত্তর দেয় বুদ্ধদেব সরকার। তারণ হা হো করে হাসে, বলে --- ওঃ বুদো ! এরপর কখন - কবে বুদ্ধদেব বুদো থেকে বুড়ো হয়ে গেছে, তার কোনো হিসাব পরিসংখ্যান নেই।

সেই শু, তারপর বয়স যত বেড়েছেশ্মশানের প্রতি আগ্রহও বেড়েছে। সাংসারিক জীবনের কলহ, বাবা - দাদার ব্যবসা সংক্রান্ত গোলযোগ, বাড়ির অবহেলা সবকিছুকে মাথায় নিয়ে বুড়ো হয় গেছেশ্মশান ফুলটাইমার। বলতে গেলে বছর দুয়েক ২৪ ঘন্টা করেই ডিউটি দিয়েছেশ্মশানে। যে সময় পরিচয় বেড়েছে, মদ - গাঁজা খেতে শিখেছে তখন থেকেই বুড়ো জেনেছে, এই শ্মশানটার ভিতর আর একটা অন্য শ্মশান রয়েছে। এখন সে ২৮ বছরের সক্ষম যুবক ।শ্মশানে কাটে দিনরাতের প্রায় ১২-১৩ ঘন্টা। এবারে মড়ার কাঠকয়লাগুলোর লিজ নিয়েছে বুড়ো। একবছরের চুক্তি, বেশ মোটা টাকা লেগেছে, আমদানিও আছে ভালো। এছাড়া কয়লা ধুয়ে ফ্রেস করার বুড়ো নিজে করেনা, দুজনে লোক লাগাতে হয়, তাদের কিছু কিছু টাকা দিলে তারাই করে দেয়।

এটা ভাবলে অবশ্যই ভুল হবে, বুড়োরশ্মশানে আসাটা শুধু পেশার কারণে। বুড়োর কথায়----এখনশ্মশান আমারপেট চালায়, তবুও শ্মশান টানে --- একবার না আসলে ভালো লাগে না কিছুই ; আসলে বুড়োও এক প্রকৃতির শ্মশান ভবঘুরে।

যদিও অনেকবেশি স্বাভাবিক, মানসিকভাবে সুস্থ ও উপার্জনশীল। তার কাজ মৃতদেহ পুড়ে যাবার পর জল ঢালা হয়ে গেলে জগু ও হরেনকে বলে কয়লাগুলো বাছাই করে গাদায় ফেলা আর মদপার্টির সঙ্গে মদ খাওয়া, পাল্লায় পড়ে গাঁজা খাওয়া ও শ্মশানের উটকো ঝামেলা - অশান্তির প্রত্যেক দ্রষ্টা হওয়া। বুড়োর স্বপ্ন এরকমই কাটুক ওর আগামী দিনগুলো।

বড় অদ্ভুত! ঝ, রাম, লজেন বা বুড়োরা এই রকমভাবে বাঁচতে চায় কেন ? কেন প্রায় এরকম শ্মশান ভবঘুরের মতো বাঁচে হরিপুরে ব্রহ্ম শাসন ছাড়িয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে নতুন গজিয়ে ওঠা শ্মশানের ষষ্ঠী, কিংরা চূর্ণির ধারে কালীনারায়ণপুরে ট্রেন থেকে গার্জেনের মতো দেখাতে শ্মশানটার হরি (হরিশচন্দ্র দাস)। হয়তো সামাজিক একটা অবহেলা আছে, পারিবারিক অনটন আছে, মানসিক বিকারও থাকতে পারে। হয়তো এরা উভচর সম্প্রদায়। তাই জীবনের স্বীকৃতি নিয়ে এরা বেঁচে থাকে মৃত্যুর প্রাঙ্গণে। আসলে শ্মশান ওদের ভালো লাগে। ভালো লাগার পিছনে একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা কিংবা জীবন প্রবাহের বাইরে এসে পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করা -- এইসব কিছুই কারণ হতে পারে। হতে পারে ওরা কেউ কেউ নেশায় আসক্ত। তবু দলাদলি, মারামারি, খুন - জখম এরা কেউ করে না। শ্মশানকে ভালোবাসেই ওরা শ্মশান ভবঘুরে হয়েছে. ভাবলে অবাক হতে হয় দেশের প্রান্তে প্রান্তে এরকম কত ভবঘুরেই না বেঁচে রয়েছে। অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক চুল্লির সাজানো - গোছানো শ্মশানগুলোতে হয়তো ভাবঘুরেদেরওপরিবর্তন ঘটেছে। তবু ওরা চারিত্রিকভাবে এরকমই। এই মুহূর্তে সমগ্র রাজ্যে বা সারা ভারতবর্ষে ওদের পরিসংখ্যান তৈরি করা একটা বড় গবেষণার কাজ হতে পারে। সংখ্যাটা জানলে অন্তত বোঝা যাবে একটা অবহেলিত, প্রায়সমাজ বহির্ভূত সম্প্রদায়ের শ্রেণি পরিচয়। যে শ্রেণি বা সম্প্রদায় কোনদিন শ্রেণিবদ্ধ আন্দোলন করবে না, দাবি করবে না জীবনের মৌল উপাদানের। মৃতের আস্তানায় প্রায় মৃতদের মত ওরা জীবন কাটিয়ে দেবে। তবু আজ ওরা সাহিত্যের সম্পদ হতে পারে, এক নিবিড় সমালোচনার বিষয় হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীর গবেষণার জন্য ওরা হতেপারে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানসিক রোগী।

যে ভবঘুরে সম্প্রদায়ের স্বভাবধর্ম কিছুটা আছে নীলুর মধ্যে। ছেলেবেলায় স্কুল পালিয়ে নীল্ গোরস্থানে যেত। স্কুল থেকে হাঁটা পথে আধঘন্টারও বেশি। জনবসতি সেখানে শেষ। ধু-ধু বিস্তীর্ণ একটা এবড়ো - খেবড়ো মাঠ। মাঝে মাঝে দু - একটা কাঁটা গাছ, ঝোপঝাড়। ক্লাস সেভেনের একটা অশান্ত ছেলে দু- একজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গোরস্থান চষে বেড়াতে সারাটা দুপুর। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে উঁকি দিত বসে যাওয়া গর্তের দিকে। মড়ার খুলি দেখতে পেত, বুকের পাঁজরগুলো দেখতে পেত। চরম কৌতূহল নিয়ে মাঝে মাঝে মাটির ঢেলা কুড়োত। মৃতের ফলক পড়ে হিসেব করে দেখত, কে কত বছর বয়সে মারা গেছে। ফেরার সময় হাতে থাকত বুনো ফুলের থোকা। এইভাবেই কেটেছে তিন চারটে বছর। নীলু যখন এগারো ক্লাসে, সে সময় বনবিভাগ থেকে সারা গোরস্থানে গাছ লাগানো হয়েছে। বছর দুয়েকের মধ্যেই প্রায় একশো বিঘা ধু-ধু জমি জঙ্গল হয়ে উঠেছে। তারপরও নীলু গেছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে কোন কোন বিকেলে পৌঁছে গেছে গোরস্থানের ওপারে, ফিরেচে ঘুর পথে। কোনো কোনো সন্ধ্যাবেলা গোরস্থানে ঢোকার মুখে ভাঙা নির্জন ঘরে একা বসে থেকেছে ঘন্টার পর ঘন্টা। জীবনের ভালোলাগা - ভালো না লাগা বহু মুহূর্তে নীলু ছুটে গেছে গোরস্থানের বুকে। হয়তো গোরস্থানে কোনো নিষেধ ছিল না, হয়তো গোরস্থানে একটু জোরে গান গাইলে কেউ টিপ্পনী কাটত না, হয়তো গোরস্থানে কাঁদা যেত মন খুলে, চিন্তাভাবনা করা যেত প্ল্যনচেট নিয়ে । এই গোরস্থান নীলুর কাছে এক অন্য অনুভূতি, এক অন্য জগতের সন্ধান এসে দিয়েছে জীবনের দশ - একগারোটা বছর। এই প্রবন্ধ লেখার আগে যখন গোরস্থান গেলাম, সে সুখ পাইনি। তিন- চার বছর আগের গোরস্থান ---ভবঘুরে নীলুর সেই গোরস্থান এখন আর নেই। তখন গোরস্থান ছিল শান্তিপুর শহরের উপান্তে আর এখন ক্রমশ শহর গোরস্থানকে গ্রাস করছে। পর্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক কলোনি হয়েছে, বিদ্যুতের খুঁটি বসেছেরাস্তা জুড়ে, সর্বদা যাতায়াত করছে অজস্র মানুষ। তবু একটু জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মাথার মধ্যে তখন একটাই চিন্তা ঃ গোরস্থান ভবঘুরের এই আংশিক জীবনে কেন এসেছিল তারা ? উৎস কোথায়এই ভবঘুরে জীবনের ? কেন শ্মশান - ভবঘুরে হয়েই বেঁচে থাকে বুড়ো, লজেন কিংবা ষষ্ঠী, হরিশচন্দ্ররা ? উত্তর হতে পারে এটাই---

‘‘বনের পাতার মত কুয়াসার হলুদ না হতে,

হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে পড়ে গেছি ঝরে !
তোমার বুকের’ পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে ;
তোমার দুইটি চোখ প্রিয়ার চোখের মত ক’রে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু - পথ ঢের দূরে স’রে
প্রেমের মতন হয়ে ! ---তুমি হবে শান্তির মতন !
তারপর স’রে যাব, ---তারপর তুমি যাবে মরে,
অধীর বাতাস লয়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন !
মৃত্যুর মতন তবু বুজে যাক, ----ঘুমাক মৃত্যুর মত মন !”
(জীবন ধূসর পাণ্ডুলিপি -----জীবনানন্দ দাশ)

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com